

আমরা সরকারি কোনো কোনো বিভাগের নিয়ম-কানুন পরিবর্তন করে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে এনে দেশকে উন্নত করতে চাই। এজন্য ছাত্র-জনতার সাম্প্রতিক অসমাপ্ত বিপ্লবের ওপর ভর করে সামনে এগোচ্ছি। ফল কতটুকু ঘরে আসবে এখনোও অজানা। রাষ্ট্রীয় বিধান পরিবর্তনের চেষ্টাও চলছে। দেশের উন্নতি কতটুকু হবে তাও অজানা। কারণ শুধু নিয়ম নীতি পরিবর্তনই যথেষ্ট নয়, নিয়ম নীতি অনুসরণ ও বসবাসরত মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনও অধিক বিবেচনার বিষয়। আমরা দেশ ও দেশের উন্নতির যত পরিকল্পনাই করি না কেন, সফলতা নির্ভর করে সমাজে বসবাসরত মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন, সামাজিক শিক্ষার অবস্থা এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষামানের উন্নতির ওপর। কারণ আমরা কেউই সমাজের বাইরে নই। পরিবারের সমষ্টি সমাজ, সমাজের সম্মিলনে রাষ্ট্রের গঠন। সমাজ একটা গতিশীল অবস্থা ও পরিবেশের সমষ্টি, যার গতিপথ দেশচালকরা মনমতো পরিবর্তন করতে পারেন। কিংবা বলা যায়, দেশচালকরা যেভাবে দেশ পরিচালনা করেন, দেশের মানুষ তাদের সাথে চলতে চলতে পরিণামে মানুষের মন-মানসিকতা সেভাবেই গড়ে ওঠে; প্রতিফলিত হয় সমাজের কাজে-কর্মে। এতে কোনো সমাজ সংস্কারক দেশ-পরিচালকদের সক্রিয় সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া দেশের কোনো কোনো সামাজিক বিষয়ে কিঞ্চিৎ নাড়া দিতে পারেন, মনমতো আমূল পরিবর্তন করতে পারেন না।

স্বাধীনতার পর থেকেই এদেশের সমাজব্যবস্থা ও সমাজে বসবাসরত মানুষের মন-মানসিকতার প্রভূত পরিবর্তন হয়ে চলেছে। যদি প্রশ্ন করি, সমাজে মানুষের অবস্থান ও চিন্তা-চেতনা সুস্থ মানুষের মতো আছে কি? যে দুর্নীতিকে সমাজ ঘৃণার চোখে দেখতো, এখন মনের আয়নার উলটা রূপ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আমি গবেষণা করে দেখেছি, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেও ঠগবাজ ভরে গেছে। এতে প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কাজের পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে। ভুগছে সমাজ ও সমাজের মানুষ। মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের গুণ বিলীন হয়ে গেছে। অনেকের মুখের কথার সাথে কাজের আদৌ মিল নেই। কুটিল বুদ্ধি খাটিয়ে প্রতারণা ও ফাঁকিবাজি রপ্ত করেছে; দুর্নীতির মহোৎসব চলছে। আমরা অজানা ভোগবাদী উদ্দেশ্যের দিকে অবিরাম বেগে ছুটছি। চাকরিতে, ব্যবসায়, পেশায় মিথ্যাচার, প্রতারণা শেকড় গেড়ে বসেছে। সমাজের মানুষের ভেজাল চিন্তাধারায় ভেজাল খেয়ে-পরে প্রত্যেক মানুষের আয়ু ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। মারাত্মক রোগে, দুর্দশা-দুর্গতিতে সমাজের মানুষ অবিরাম কাতরাচ্ছে। এই নিরুদ্দিষ্ট ভোগের নেশায় অবৈধ টাকা জোগানোর জন্য মানুষ উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। কোথায় জীবনের উদ্দেশ্য! কোথায় অবহেলিত, দুর্গত, অসহায়ের আর্তি শোনার একদণ্ড অবকাশ! পরিদ্রাণের একটাই আহ্বান, ‘আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে’। মানুষের মগজ সংস্কার না করা হলে রাষ্ট্র সংস্কারে কাজ হয় কীভাবে? এজন্যই সমাজ সংস্কারের প্রশ্ন আসে।

শুধু রাজনীতিকদের হাতে আমরা জিম্মি না থেকে দল বেঁধে নিজেদের সমাজ সংস্কারের কাজ নিজেরাই করতে পারি। কারণ বর্তমান বিরাজমান সমস্যা অন্তর্বর্তী সরকারের কিছুসংখ্যক বিভাগের সংক্ষিপ্ত সংস্কারের ফলে দূরীভূত হবে বলে কখনোই মনে হয় না। এ ধরনের আক্ষেপ ও প্রতিবিধানের ব্যবস্থার কথা এ পত্রিকাতেই দীর্ঘদিন ধরে লিখে আসছি। প্রসঙ্গত, অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কারে এদেশের রাজনীতিকদের কর্ম ও চিন্তা-চেতনায় রাষ্ট্রের ও জনগণের কাছে সরাসরি কোনো জবাবদিহিতা ও আইনগত দায়বদ্ধতার তেমন কোনো ব্যবস্থা থাকবে বলে দেখা যাচ্ছে না। অথচ উলু দিয়ে কাছিম জড়ো করার মতো বর্তমান রাজনীতি ক্ষমতা ও টাকা ছিটিয়ে বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন, স্বার্থান্ধ-দুর্নীতিবাজ ও মতলববাজ লোকদের একজায়গায় জড়ো করছে। তাছাড়া বিধিবদ্ধ সংস্থাসহ সরকারের নির্বাহী বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের অবৈধ রাজনীতিপ্রীতি ও লাগামহীন দুর্নীতির কোনো প্রতিবিধান দৃশ্যত নেই। সুতরাং পচা-দুর্গন্ধযুক্ত সমাজে সংস্কারের নামে যা করা হচ্ছে, প্রয়োজনের তুলনায় তা যতসামান্য। এছাড়াও ক্ষমতায় আসতে তৎপর দলগুলোর দেশ ও রাজনীতি সংস্কারের দিকে অধিক মনোযোগী না হয়ে এবং ভবিষ্যতে আধিপত্যবাদী শাসনমুক্ত স্বকীয়-স্বাধীন উন্নত দেশ গড়ার প্রত্যয় আন্তরিকভাবে মনে পোষণ না করে অনৈক্যের

কারণে অতি দ্রুত ক্ষমতায় বসার ব্যবস্থা করার জন্য উঠেপড়ে লাগাও অন্তর্বর্তী সরকার ও ছাত্রজনতার বিপ্লবের আংশিক সফলতার জন্য দায়ী। শ্রুতিকটু কথাটা হলো: বিশ্বের অধিকাংশ দেশের রাষ্ট্র-পরিচালকদের মানসিকতাই তো সুস্থ নয়, তা সুস্থ সমাজব্যবস্থা ও আদর্শ রাষ্ট্র গড়ে উঠবে কীভাবে?

মানুষের অন্তর্নিবিষ্ট স্বভাব বাদ দিলে সুশিক্ষা ও যোগ্য প্রশিক্ষণ এবং সুস্থ সমাজব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষকে ‘মানুষের মতো মানুষ’ রূপে গড়ে তোলা যায়। সমাজ সংস্কারের জন্য প্রথমত দরকার একটা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে এদেশের প্রতিটি জনপদে দলমত নির্বিশেষে সেই সমাজের অভ্যন্তর থেকে বাছাইকৃত সুশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবী, নির্বিবাদি-সং, উদারমনা কিছু লোক, যারা সমাজ পচে গেলেও সুশিক্ষার প্রিজারভেটিভ মেখে এখনো সমাজে অক্ষত আছেন। এদেরকে একত্রিত করে আমরা সমাজ সংস্কারের কাজ করতে পারি। এরা এদের সমাজের প্রতিটা মানুষকে চেনেন-জানেন। এর নাম ‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’ বলা যায়। উদ্দেশ্য মানুষের মগজের সংস্কার, সমাজ সংস্কার ও মানবসেবা। একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, আমার মতো শত শত সমাজ সংস্কারকর্মী এ পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতায় সমাজ সংস্কারের বীজ তিন বছর আগেই আনুষ্ঠানিকভাবে বপন করেছিলেন। আজ সে বীজের চারা কচি-কিশোলে ভরে উঠতে শুরু করেছে, অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার ও ভবিষ্যত সরকার সমাজের স্বার্থে আমাদের স্থান করে দিতে এগিয়ে আসবে বলে আমরা আশাবাদী। সমাজ সংস্কারের জন্য কেন্দ্রীয় সংগঠনের রেজিস্ট্রিকৃত নাম দেওয়া হয়েছিল ‘জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ’ (জাশিপ)। মূলত জাশিপের উদ্দেশ্য অরাজনৈতিক ও অলাভজনকভাবে সমাজ সংস্কারের তথ্য প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত ও সুশিক্ষিত সমাজ গঠন করা। মানুষের ভুলগুলো ধরিয়ে দেওয়া, সুশিক্ষা দেওয়া, মনের অন্তস্তলে নৈতিকতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, মানবতাবোধ, সুনীতির ধারণা, বিবেকের তাড়না জেনে জেনে জাগিয়ে তোলা। পার্থিব বিষয়ে জনকল্যাণ সাধন করতে পারলে পারলৌকিক কল্যাণসাধনও সম্ভব— এ ধারণায় মানুষকে উজ্জীবিত করা।

ছাত্রছাত্রীদের সুশিক্ষিত বানাতে শিক্ষাব্যবস্থার পাঠ্যসূচিতে আমূল পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। পাঠ্যসূচির ভিত্তিমূল হতে হবে— লেখা, পড়া, গণিত, ধর্ম, গবেষণা বা অনুসন্ধান, জাগ্রত বিবেকবোধ ও ন্যায়নিষ্ঠা। এ উপাদানগুলো শিশুমনে সুদৃঢ়ভাবে প্রথিত করে দিতে হবে। এ কাজগুলো কমপক্ষে দশম শ্রেণি পর্যন্ত চলতে থাকবে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় এ ভিত্তিমূলগুলোর অভাব ভীষণভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ ব্যবস্থার আশু পরিবর্তন করতে হবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে তিনটি— জীবনমুখী শিক্ষা, মনুষ্যত্ববোধ-সম্পর্কিত শিক্ষা, এবং কর্মমুখী শিক্ষা। জীবনমুখী শিক্ষা ও মনুষ্যত্ববোধ-সম্পর্কিত শিক্ষার দীর্ঘ তালিকা তৈরি করে তা গুরুত্বানুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে বণ্টন করে দিয়ে ব্যবহারিকভাবে শেখাতে হবে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় তিনটি উদ্দেশ্য-সাধনেই অসম্পূর্ণতা ও ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। ফলে সুশিক্ষা অর্জিত হচ্ছে না। তাই জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদও বলা যাচ্ছে না। এদেশে শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তবায়ন সমস্যাও প্রকট। ব্যবস্থাপত্রের অতি সামান্য অংশ প্রতিপালিত হচ্ছে। প্রকৃত শিক্ষার বাজার দারুণ মন্দা। এভাবে জাতি বেশিদূর এগোতে পারে না। শিক্ষার এ দৈন্যদশা পুরো সমাজে ছড়িয়ে গেছে। এছাড়া দেশব্যাপী রাজনীতির নোংরামি, সামাজিক বিভাজন ও দেউলেপনা পরিবেশকে কলুষিত করে ফেলেছে। সমাজ গেছে নষ্ট হয়ে। সেজন্য দেশ ধ্বংসের প্রান্তসীমায় এসে সমাজ সংস্কারের আশু প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে।

সমাজের এ অবস্থাকে সুষ্ঠুপথে পরিচালিত করা কঠিন কিছু নয়, ইচ্ছাশক্তিই যথেষ্ট। প্রয়োজন পথহারা রাজনীতিকে সুপথে ফিরিয়ে নিয়ে আসা এবং সমাজ সংস্কারে দেশ-পরিচালকদের সাহায্য-সহযোগিতা নেওয়া; Inclusive society এবং Integrated education system। সমাজ সংস্কারের জন্য প্রথমেই সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে একই ডোরে গেঁথে গাঁটছড়া বাঁধতে হবে। গঠিত সংগঠন একটি নীতিমালা ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাজগুলো করবে। প্রতিটি এলাকায়ই স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা আছে। বিকালের পর এগুলো খালি থাকে। বর্তমানে গ্রাম-গঞ্জের লোকজন সারাদিনের কর্মশেষে বিকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত বিভিন্নভাবে অবসর সময় কাটায়। সংগঠন স্কুল-মাদ্রাসার অবকাঠামো ব্যবহার করে সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক প্রশিক্ষণ, সফটস্কিলস ট্রেনিং, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ও আর্থিক সহায়তার কাজ করবে। অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে, আবার কখনো রাষ্ট্রীয় উৎস থেকে প্রান্তিক এ জনগোষ্ঠীর আর্থিক সহযোগিতা ও ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের কাজ

অব্যাহত রাখতে এবং বন্টনব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত করতে গঠিত এ সমাজ গঠনমূলক ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। সামাজিক শিক্ষা বৃদ্ধি করতে সাধারণ মানুষকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়া, ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া এবং জীবনমুখী প্রশিক্ষণ দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই, যে দায়িত্ব এ সংগঠন পালন করতে পারে। প্রতিটি এলাকায় এ সংগঠন অভিভাবকসহ সাধারণ মানুষকে সুশিক্ষা দেবে, কাউন্সিলিং করবে, সমাজসেবা দেবে, প্রশিক্ষণ দেবে, তাদেরকে শিক্ষা-সচেতন জনগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তুলবে। এভাবে সামাজিক শিক্ষাবলয় গড়ে তুলতে পারলে সমাজে শিক্ষার উন্নতি হবে, সামাজিক অপরাধ, রাজনৈতিক সংঘাত ও অপচিন্তা অনেকটাই কমে আসবে। সাধারণ মানুষকে জনে জনে সামাজিক শিক্ষার মাধ্যমে সুস্থ চিন্তাধারার বিকাশসাধন করবে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের সম্মিলনে ত্রি-পক্ষীয় সম্পর্ক গড়ে তুলবে। তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে উচ্চশিক্ষা বা টেকনিক্যাল শিক্ষায় শিক্ষিত করতে বলবে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার তত্ত্বাবধান করবে। স্কুল-মাদ্রাসাগুলোতে ‘ফুল-টাইম স্কুলিং’ ব্যবস্থার দিকে ক্রমশ নিয়ে যাবে। স্কুল-মাদ্রাসার অবকাঠামো ব্যবহার করে অভিভাবকদের ও সাধারণ মানুষের জন্য সাধারণ ও ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। সামাজিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সামাজিক অবক্ষয় রোধ করবে। বর্তমানে মাদকের অপব্যবহার (ড্রাগ-এবিউজ) সমাজে টিন-এজারদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করেছে। এ সংগঠন শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে নিয়ে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করবে।

গরিব, নিঃস্ব, পীড়িত, অসহায় ও মেহনতি মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আর্থ-মানবতার সেবায় আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করবে। শেগিভেদে, বিশেষ করে নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীর ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের মাধ্যমে সুদবিহীন স্বল্পকিস্তিভিত্তিক আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে মানুষকে কর্মমুখী করে গড়ে তুলবে। এভাবে সামাজিক ব্যবসার মডেলও তৈরি করা সম্ভব। বেকার ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে এলাকাভিত্তিক ছোট-মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানও গঠন করা যেতে পারে। এ সংগঠন নিজ নিজ এলাকায় একটি ক্লিনিক ও একটি কমিউনিটি পাঠাগার তৈরি করবে। স্বাস্থ্যশিক্ষার জন্য সেমিনার, হাতে-কলমে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে। সমাজের মানুষের সামাজিক স্বাস্থ্য-সচেতনতা বৃদ্ধি করবে এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করবে। সংগঠন উপজেলা বা জেলার কোনো মানবহিতৈষী এক বা একাধিক ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করতে পারে, যিনি বা যারা সপ্তাহে ভিন্ন দিন ক্লিনিকে এসে বিনা ফি-তে বা নামমাত্র ফি-তে রোগী দেখবেন। এতে সাধারণ মানুষ যারপরনাই উপকৃত হবে।

এ সংগঠন প্রতিটি মসজিদের ইমামকে অনুরোধ করবে মসজিদে খুৎবা দেয়ার আগে বাংলাতে বক্তৃতা দেওয়ার সময় মুসলমানের বৈশিষ্ট্য কী হওয়া উচিত, প্রতিহিংসার পরিণতি, অজ্ঞতার পরিণতি, স্বাস্থ্যশিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখার গুরুত্ব, পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব, মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য, প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব, গরিব-দুঃখীকে দানের সাওয়াব, সাম্প্রদায়িক অহিংসা, সমাজসেবা সম্বন্ধে কোরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা, সমাজসেবকের ইহকাল ও পরোকালের প্রাপ্তি, দুনিয়ার সমস্ত ন্যায়-কাজ ও পেশাগত সমস্ত কাজও ইবাদতের অংশ ইত্যাদি বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী করে বক্তৃতা দিতে। মসজিদের ইমামকেও সমাজসেবার জন্য সাথে নিতে পারেন। সংস্কার-কর্মীদের কাজ হচ্ছে, তাদের আওতাধীন বিভিন্ন মসজিদ-মাদ্রাসায় নিয়মিত যাওয়া; সব মাদ্রাসায় জীবনমুখী, কর্মমুখী ও জীবনের উদ্দেশ্যভিত্তিক শিক্ষা চালু করার জন্য অনুরোধ করা। ছাত্রছাত্রীরা যেন বিজ্ঞান ও ব্যবসামুখী কিংবা কারিগরি শিক্ষা নিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে সে কথা বুঝিয়ে বলা।

এখানে বড় আকারের কোনো খরচ নেই। বলা যায়, বিনামূল্যে সমাজের মানুষ সমাজসেবা পাবেন। শুধু প্রক্রিয়াটা একবার চালু করে দিতে পারলেই হবে এবং পরবর্তী সময়ে এটা সামাজিক প্রক্রিয়ারও একটা অংশ হিসেবে রূপ নেবে। এ ব্যবস্থাকে চালু রাখতে পারলে ভবিষ্যতে সমাজ-সংস্কৃতির একটা অংশ হিসেবে দেখা দেবে। দীর্ঘ বছরে সমাজের যে নেগেটিভ পরিবর্তন হয়েছে, এ প্রক্রিয়ায় সমাজ পজিটিভ পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাবে।

তবে সমাজ সংস্কারের সব বিষয়ে সরকারের সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন। প্রতিটি জেলার জেলা-প্রশাসক কর্মকাণ্ড দেখাশোনার দায়িত্বে থাকবেন। একজন অতিরিক্ত জেলা-প্রশাসক, জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসার; জেলা ও উপজেলা সমাজকল্যাণ বিভাগ এবং স্বাস্থ্য বিভাগ উপজেলার প্রতিটা অঞ্চলে যোগ্যতার ভিত্তিতে ‘জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে ‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’ গঠন করবেন এবং সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান ও সহযোগিতা করবেন।

শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তবায়ন করবেন। সমাজ সংস্কার একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিতে হবে। এ সংগঠনের পুরো কর্মকাণ্ডটাই হবে ব্যষ্টিক উন্নয়নের মডেল আকারে এবং সামাজিক উন্নয়নে মানবসম্পদ তৈরির প্রক্রিয়া হিসেবে। মানবসম্পদ উন্নয়ন তথা জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও মানসিকতার উন্নয়নও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনুগামী একটা সহায়ক উপাদান। এ বিষয়ে ‘জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ’ সবসময় অগ্রাধি ভূমিকা পালন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

(১৯ ফেব্রুয়ারি ’২৫ দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় বাতায়ন কলামে প্রকাশিত)

লেখক: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।

Web: pathorekhahasnan.com